42.1 খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২ খ্রিঃ) (Khilafat Movement (1919-22 AD))

রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নৈতিক কারণে সবাই সাড়া দেবে—গান্ধিজির এই আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তিনি জানতেন যে, জাতীয় আন্দোলনে সবাইকে একত্রিত করতে না পারলে, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে ঐক্যবন্ধ করার জন্য শ্রেণি সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে ধর্মীয় বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সাধারণ অশিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের ঐক্য ও সংহতির একটি প্রধান সূত্র হল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আবেদন। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে গান্ধিজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেস্টা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব নয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লখনউ চুক্তির ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবন্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য আরও সুদৃঢ় করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কঠোর দমননীতি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পটভূমি তৈরি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ মে ''সেভরের চুক্তি'' দ্বারা মুসলিম জগতের ধর্মগুরু খলিফাকে গদিচ্যুত করা হলে এবং ইংল্যান্ড তুরস্কে কিয়দংশ দখল করে নিলে বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শক্তি হিসাবে সেভরের চুক্তির শর্তানুযায়ী তুরস্ক মিত্রশক্তিকে সুদান, মরক্কো, মিশর, সাইপ্রাস, ত্রিপোলি, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, টিউনিশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এককথায় সেভরের চুক্তির মধ্য দিয়ে তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। তুরস্কের সুলতান ছিলেন ইসলাম জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা। খলিফার ভবিষ্যৎ ভারতীয় মুসলমানদের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, খলিফার ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতীয় মুসলিমরা ও খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

খিলাফৎ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন ধারা নিয়ে এসেছিল বলে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র মন্তব্য করেছেন। রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। এই খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে গান্ধিজি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে স্থাপনের এক অপূর্ব সুযোগ দেখেছিলেন। কেরালার মালাবার উপকূলের মুসলিম কৃষকদের উপর ব্রাহ্মণ জমিদারদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে মোপলা বিদ্রোহ শুরু হয়। গান্ধিজি এই বিদ্রোহে যোগদানকারীদের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা ব্রিটিশ সরকার হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির যে চেস্টা করেছিল, গান্ধিজি খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে তা দূর করতে সচেস্ট হয়েছিলেন। গান্ধিজি মনেপ্রাণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে খিলাফৎ প্রশ্নে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে যদি রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডজনিত বিক্ষোভকে যুক্ত করা যায়, তাহলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের এমন সুযোগ পাওয়া যাবে, যা আর একশো বছরে আসবে না। গান্ধিজি **'ইয়ং ইন্ডিয়া'** পত্রিকায় খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে খিলাফৎ সম্মেলনে গান্ধিজিকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই বছরই ১৭ অক্টোবর খিলাফৎ সম্মেলনের আহ্বানে সারা দেশে 'খিলাফৎ দিবস' পালন করা হয়। গান্ধিজি জাতীয় দাবির সঙ্গে খিলাফতের দাবিগুলিকে যুক্ত করে এক শক্তিশালী ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সচেস্ট হন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক নীতি থেকে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লখনউর মৌলনা আবদুল বারির, মৌলানা মুহম্মদ আলি এবং মৌলানা সৈকত আলি নামে তাঁর দুই শিষ্য খলিফার অধীনে মুসলিম তীর্থস্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য ''অঞ্জুমান-ই-খুদ্দাম-ই-কাবা' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একই উদ্দেশ্যে এবং একই সময়ে মৌলনা ওবেদুল্লা সিন্ধি দিল্লিতে 'নজরাতুল মারিফ' নামে আর একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের কার্যকলাপে ভীত সরকার ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মুহম্মদ আলিকে গৃহবন্দি করেন। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায় সরকারের উপর আরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ী 'মুজলিশ-ই-খিলাফৎ' গঠন করে খলিফার অপমানের প্রতিবাদ করেন। শেষ পর্যন্ত মৌলানা আবদুল বারির নেতৃত্বে লখনউ শহরে আহূত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে ''নিখিল ভারত খিলাফৎ

কমিটি'' গঠিত হয়। লখনউতে গঠিত হলেও এই কমিটির প্রধান কার্যালয় ছিল বম্বেতে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ নভেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় কমিটির প্রথম অধিবেশন চলে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ফজলুল হক। এই অধিবেশনে ইংরেজদের বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণ না করা এবং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও অসহযোগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধিজি এক বিশেষ অধিবেশনে মুসলমানদের দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে মুসলমানদের সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস জানান।

খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের মূলদাবি ছিল তিনটি। এই দাবিগুলি হল—(i) খলিফার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা; (ii) মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র মক্কা ও মদিনার উপর বিদেশি হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ এবং (iii) আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মেসোপটেমিয়ায় খলিফার প্রাধান্য বজায় রাখা। এই দাবিগুলি ছাড়াও 'নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি' **সরকারি উপাধি ও অবৈতনিক কাজ বর্জন, সরকারি রাজস্ব প্রদান বন্ধ করা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে যোগদান না করা** ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরও জোর দিয়েছিল। গান্ধিজি ছাড়া **মতিলাল নেহেরু, বালগঙ্গাধর তিলক** এবং **মদনমোহন মালব্য** প্রমুখ নেতৃবৃন্দ খিলাফতিদের দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

খিলাফৎ প্রশ্নে সমস্ত মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ছিল না। প্রথম দিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল বোম্বাইয়ে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের হাতে, যারা সভা-সমিতি স্মারকলিপি ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের ক্ষোভ ব্রিটিশ সরকারকে জানাতে থাকেন। এই সময়ে **বোম্বাই, দিল্লি, লখনউ, আলিগড়, পাটনা, কলকাতা** প্রভৃতি স্থানে খিলাফত আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। **বোম্বাই খিলাফতিরা রক্ষণশীল ও চরমপন্থী ইসলামবাদী নেতাদের মধ্যবর্তী একটি নীতি অনুসরণ করেছিলেন।** এই মধ্যপন্থী মুসলিম বণিকগোষ্ঠী নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিদেশি পণ্য বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যদিকে খিলাফৎ কমিটির তরুণ প্রগতিশীল সদস্যরা সারাদেশ ব্যাপী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। **সিন্ধু, মালাবার, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায়** তরুণ খিলাফতিদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এইসব অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত বিশেষত **সাংবাদিক ও উলেমা** এদের প্রভাব ছিল। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধিজির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন তিনি **মধ্যপন্থী খিলাফতি ও প্রগতিশীল তরুণ খিলাফতিদের** মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সংযোগকারী সেতু। খিলাফতিরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন কারণ তাঁরা জানতেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে না উঠলে সারা দেশব্যাপী কোনো আন্দোলন সফল হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে বকর ঈদে গোরু কুরবানি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ মে 'সেভরের চুক্তি' (তুরস্কের সঙ্গে) ও ২৮ মে হান্টার কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে খিলাফৎ আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। সেভরের চুক্তি খিলাফতিদের হতাশ করে, কারণ এতে খিলাফতিদের তিনটি দাবির দুটি অগ্রাহ্য করা হয়। ভারতীয় মুসলমানরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতির কথা বলেন। কিন্তু গান্ধিজি প্রথমদিকে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও তুরস্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া সেভরের চুক্তির কঠোর শর্তাদি এবং হান্টার কমিশনের রিপোর্ট তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার এবং জেনারেল ডায়ারকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনোরূপ দায়ী না করে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বৃহত্তর আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি বড়োলাটকে জানায় যে, মুসলমানদের দাবি না মানা হলে ১ আগস্ট থেকে তারা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন এবং হিন্দুদেরও এই আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হবে। অসহযোগ আন্দোলনের চারদফা কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। **প্রথমত,** সরকারি খেতাব ও সাম্মানিক পদ বর্জন করা, **দ্বিতীয়ত,** সরকারি অসামরিক পদে ইস্তফা দেওয়া, **তৃতীয়ত,** পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ করা, **চতুর্থত,** খাজনা প্রদান বন্ধ করা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১ আগস্ট গান্ধিজির নেতৃত্বে হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত **''কাইজার-ই-হিন্দ''** উপাধি ত্যাগ করেন। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। মহম্মদ আলি জিন্না, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। ওই বছরই কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হওয়ায় গান্ধিজির নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হয়। অহিংস অসহযোগের নীতি খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মুসলিমরা গান্ধিজিকে সমর্থন করেন। গান্ধিজি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ''স্বরাজ আমরা লাভ করবই''। গান্ধিজি খিলাফৎ আন্দোলনের সুযোগে সর্বভারতীয় আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি করেছিলেন ("There are two things of which I am devoting my life—permanent unity between Hindus and Mohamedans and Satyagraha")। আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডঃ আনসারি, জাফর আলি খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের খিলাফৎ আন্দোলনে সামিল হলে আন্দোলন গতিশীল হয়ে ওঠে।

গান্ধিজি ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারাদেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সময় তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হওয়ায় পূর্ববর্তী **সেভরের সন্ধি** বাতিল করে **লোজানের সন্ধি** স্বাক্ষরিত হয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক খলিফাকে গদিচ্যুত করে নতুন তুরস্ক সরকার গঠন করেন। এর ফলে খলিফা পদের বিলুপ্তি ঘটে এবং খিলাফৎ আন্দোলনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। ভারতেও খিলাফৎ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে।

খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধিজি সমগ্র ভারতের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাওলাট সত্যাগ্রহ ও খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে, খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে শহুরে মুসলিমদের জাতীয় আন্দোলনে সামিল করা সম্ভব হয়েছিল। তবে ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করা সমীচীন হয়েছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউন যথার্থই বলেছেন যে, শুধু খিলাফতের প্রশ্নে হিন্দুদের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু খিলাফতের মতো একটি সাময়িক ধর্মীয় সমস্যাকে স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের মতো এক মৌলিক দাবির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা ঠিক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খিলাফৎ আন্দোলনকে সমালোচনা করে বলেন যে, গান্ধিজি জাতীয় ঐক্য অপেক্ষা ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন। অ্যানি বেসান্ত তাঁর "Future of Indian Politics" গ্রন্থে বলেছেন, খিলাফৎ আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতায় প্রেরণা দিয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিক খালিদ বিন সৈয়দ মনে করেন যে, খিলাফৎ আন্দোলন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রগঠন ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে চালিত করতে উৎসাহিত করেছিল। ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক অসহযোগকে যুক্ত করার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ হয় এবং এর প্রভাবে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐতিহাসিক ডা বিপানচন্দ্র এই অভিমতের আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলেছেন যে, শুধু মুসলমানদের দাবিকে কেন্দ্র করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা সঠিক নয়। তবে জাতীয় নেতৃত্ব মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক চেতনাকে ধর্মনিরপেক্ষ—রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্নার মতে, এই আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধিজি একাধারে ধর্মীয় মোল্লা ও উলেমাকে রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা ও খলিফার পুনর্বাসন অপেক্ষা আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি সমর্থন অনেক বেশি সময়োপযোগী পদক্ষেপ হত। সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ মন্তব্য করেছেন যে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থে তোলা খিলাফৎ দাবি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে তুলছে। খিলাফৎ আন্দোলনের গোঁড়া ধর্মীয় চরিত্র, বিদ্রোহী রাষ্ট্র তুরস্ক ও আফগানিস্তানের প্রতি অনুগত্য এবং প্যান-ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তখন অনেকেই ভারতে মুসলিম রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তবে তদানীন্তন সময়ে জাতীয় স্তরের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

খিলাফৎ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা যায় না। এই আন্দোলন মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের আগে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের দাবিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এমন আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি। কে. কে. আজিজের ভাষায়, ''মুসলিম প্রভুত্বের মিথ বা অতিকথন ভেঙে দিয়েছিল খিলাফৎ আন্দোলন'' ("The Khilafat Movement destroyed the myth of Muslim Royalty")।

42.2 অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা (Begining of the Non-cooperation Movement)

১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চিরাচরিত 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' ত্যাগ করে সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস সারা দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। আচার্য জে. বি. কৃপালিনী বলেন, এই ঘটনা সমগ্র জাতি ও কংগ্রেসে নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করেছিল। **জুডিথ ব্রাউনের মতে,** "Non co-operation marked a major change in the depth and dimension of concerted political hostility to the raj" (''অসহযোগ আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রকৃতিকে বদলে দিয়েছিল'')।

গান্ধিজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠার পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফৎ কমিটির ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধিজির নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী প্রত্যক্ষ গণ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিকগণ গান্ধিজির নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মূলে চারটি কারণের উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত,** কুখ্যাত রাওলাট আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সামাজিক অধিকার খর্ব করে। ফলে এই নির্মম আইনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। এই অসন্তোষই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রূপ লাভ করেছিল। **দ্বিতীয়ত,** ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। **তৃতীয়ত,** খিলাফৎ আন্দোলন ভারতীয় মুসলিমদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। ভারতীয় মুসলিমদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে গান্ধিজি সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কুখ্যাত রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাবলি

ভারতবাসীর সামনে ব্রিটিশ সরকারের স্বরূপ তুলে ধরায় ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময় হান্টার কমিশনের রিপোর্ট গান্ধিজিকে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করে। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার এবং জেনারেল ডায়ারকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান না করায় মর্মাহত গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারকে শয়তানের সরকার বলে ধিক্কার জানান। গান্ধিজি বলেন যে, ''এই শয়তানের সরকারের সঙ্গে কোনো সহযোগিতাই হল পাপ''। এই পরিস্থিতিতে সারা ভারতব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে গান্ধিজি একটি সর্বভারতীয় অহিংস আন্দোলন শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কংগ্রেসে গান্ধিজির অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহম্মদ আলি জিন্না এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধিজির মতপার্থক্য দেখা দেয়। গান্ধিজির সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিশেষত চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধ কেন হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। এ সম্পর্কে জুডিথ ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে, বাংলায় কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচনে জেতার প্রবল সম্ভাবনা ছিল বলে চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিল বয়কট করতে চাননি। রজতকান্ত রায় বলেছেন যে, ''বাঙালি নেতৃবর্গ ছিলেন 'নগর সংস্কৃতির ফসল'। তাঁরা আইন সভায় বসে আইনের কূটকচালি আলোচনা করতে ও শহুরে মধ্যবিত্তদের নিয়ে আন্দোলন করতেই ভালোবাসতেন। গান্ধিজি পরিচালিত কৃষক হরিজন প্রীতি, চরকা কাটা, সত্যাগ্রহ তাঁদের পছন্দ ছিল না''। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী গান্ধিজি ও চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, চিত্তরঞ্জন দাশের বিশ্বাস ছিল যে বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে জব্দ করা যাবে না। তাছাড়া ভারতবাসী অহিংস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে বয়কটের বিরোধী হলেও পরে অর্থাৎ নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করায় গান্ধিজির সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের মতপার্থক্যের অবসান ঘটে। প্রায় সর্বসম্মতিতেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সারা দেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যগুলি হল—(১) পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ও অন্যত্র যে নির্মম অত্যাচার ব্রিটিশ সরকার করেছে তার প্রতিকার করা; (২) খিলাফৎ সমস্যার সমাধান করা এবং (৩) এক বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' অর্জন করা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গান্ধিজি প্রথমে 'স্বরাজের' বিষয়টি গ্রহণ করেননি। পরে মতিলাল নেহেরুর পরামর্শে 'স্বরাজ' লাভের বিষয়টিকে অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু 'স্বরাজ' অর্থে গান্ধিজি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট ছিল না। তদানীন্তন বড়োলাট রিডিং যেমন স্বরাজের অর্থ বোঝেননি, তেমনি জওহরলাল নেহেরুও বলেন যে, স্বরাজের অর্থ এক এক জনের কাছে এক এক রকম। তাই জওহরলাল নেহেরু একে "Delightfully Vague" বলে মন্তব্য করেছেন।

অসহযোগ আন্দোলনে দু-ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল—(১) ইতিবাচক বা গঠনমূলক কর্মসূচি এবং (২) নেতিবাচক কর্মসূচি। ইতিবাচক কর্মসূচির মধ্য ছিল—(ক) চরকা বা তাঁতের ব্যবহার অর্থাৎ দেশি সুতায় বস্ত্র বোনা, (খ) ভারতের অসংখ্য অবহেলিত গ্রামগুলির উন্নয়ন (গ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, (ঘ) কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, (ঙ) হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতি স্থাপন এবং সর্বোপরি, (জ) অহিংস আন্দোলনকে জোরদার করা। অন্যদিকে নেতিবাচক কর্মসূচির মধ্যে ছিল—(ক) সরকারি খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি বর্জন, (খ) সরকারি আদালত বর্জন, (গ) সরকারি স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা, (ঘ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা, (ঙ) সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন করা, (চ) মদ্যপান নিবারণ এবং (ছ) বিদেশি পণ্য বর্জন করা। এই সমস্ত নেতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা। অসহযোগ আন্দালনের কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করা হলে এক বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' অর্জন করা হবে বলে গান্ধিজি ঘোষণা করেন। এই সময়ে কংগ্রেসের ৩০০ জন সদস্যকে নিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির কাজ ছিল কংগ্রেসের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনা করা। বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের ভাষা বোঝার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। সাধারণ মানুষ যাতে কংগ্রেসের সদস্য হতে পারে তার জন্য বাৎসরিক চাঁদার হার ধার্য করা হয় মাত্র চার আনা। এর ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজের নীচুতলার মানুষের সংযোগ গড়ে। এছাড়া গান্ধিজি উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হবার পর এই আন্দোলনের ডাকে সারা দেশ জুড়ে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। অসহযোগ আন্দোলনের দুটি দিক ছিল—বয়কট ও স্বদেশি এবং গঠনমূলক কর্মসূচি। গান্ধিজি, মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি (আলি ভ্রাতৃদ্বয়) মিলিতভাবে অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সক্রিয় উদ্যোগে গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে বহু প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, যেমন—চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, বিঠলভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রমুখ আদালত বর্জন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বয়কট আন্দোলনের বিশেষ সফলতা দেখা যায়। বহু শিক্ষক ও ছাত্র সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করেন। বাংলায় শিক্ষা বয়কট আন্দোলন

সবথেকে বেশি সফল হয়েছিল। এছাড়া যুক্ত প্রদেশে (U.P.), বিহার, ওড়িশা এবং আসামে শিক্ষা বয়কট ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে দক্ষিণ ভারতে শিক্ষা বয়কট আন্দোলন বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বয়কট কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিলাতি পণ্য বর্জন। স্থির হয় যে, ১৯২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিলাতি বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে দোকানে দোকানে পিকেটিং, বিলাতি বস্ত্র পোড়ানো ইত্যাদি শুরু হয়। এর ফলে বিলাতি বস্ত্র আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মাড়োয়ারি সম্প্রদায় যারা ছিলেন গান্ধিজির গোঁড়া সমর্থক তারাই বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে মাড়োয়ারিদের সংঘবদ্ধ লোভের সম্মুখে আদর্শবাদ অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিলাতি বস্ত্র বয়কট আন্দোলন বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে ব্যাপক আকার ধারণ করলে সরকার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে বিশেষ উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল এবং প্রায় ৮০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিদ্যাপীঠ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসু, জাকির হোসেন, আচার্য নরেন্দ্রদেব প্রমুখ এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রূপে যোগ দিয়েছিলেন। গান্ধিজি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার, খাদির ব্যবহার বা চরকা কাটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিহার ও ওড়িশায় পঞ্চায়েত আদালত খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিজয়ওয়াড়ায় কংগ্রেস অধিবেশনে (মার্চ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে) সদস্য সংগ্রহ, চরকা বিতরণ এবং অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার কর্মসূচি গৃহীত হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কাজ শুরু হয়। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ২০ লক্ষ চরকায় সুতো কাটা শুরু হয়। তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের লক্ষ ছিল এককোটি টাকা। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়ে আরও বেশি টাকা সংগৃহীত হয়। গান্ধিজির প্রচেষ্টায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জাতীয় স্তরে চেতনা সৃষ্টি করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র লাভ করে। জুডিথ ব্রাউনের মতে, গান্ধিজির অদ্ভুত 'ক্যারিসমা' বা চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্বের টানে আকৃষ্ট হয়ে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। সারা দেশে হরতাল, সভা-সমিতি, বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। স্বদেশি শিক্ষা ও শিল্পের প্রসারে জাগরণ এসেছিল। অন্ধ্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মাদ্রাজে চারমাস ধরে শ্রমিক ধর্মঘট চলে। শ্রমিকরা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ৪৫০ টি ধর্মঘট দেশজুড়ে পালন করেছিল। ঐতিহাসিক গজেন্দ্র রানাডের মতে, শ্রমিকরা গান্ধিজির সহায় থাকাতে আন্দোলন বেশি গুরুত্বপর্ণ হয়ে ওঠে।

সারা দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করলেও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই বয়কট সমর্থন করেননি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি শিক্ষা বয়কট নীতি সমর্থন করেননি। লালা লাজপৎ রায়ও স্কুল-কলেজ বয়কটের নীতি সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্কুল-কলেজ বয়কট সমর্থন করেননি। 'Modern Review' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও শিক্ষা বয়কট নীতি সমর্থন করেননি।

অসহযোগ আন্দোলন শুধুমাত্র বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি শ্রমিক শ্রেণিকে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সীমানা অতিক্রম করে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করে। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রশিল্প, কলকাতার পাটশিল্পে, কানপুরের পশম শিল্পে, আসামের চা বাগিচায়, জামালপুরের রেল কারখানায় এবং বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে প্রায় ৬ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী দর্শনানন্দের নেতৃত্বে আসানসোল, রানিগঞ্জ, বরাকর প্রভৃতি কয়লাখনি অঞ্চলে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এই সময় শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণিই নয়, অসহযোগ আন্দোলন কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলার মেদিনীপুরে, উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ, রায়বেরেলি, অন্ধ্রের গুণ্টুর প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা আন্দোলনে সাড়া দিয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বিহারের মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মজফরপুর অঞ্চলের কৃষকরা বিভিন্ন পুলিশ চৌকি আক্রমণ করেছিল এবং হাট-বাজার লুট করেছিল। যুক্ত প্রদেশে বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন জঙ্গি কৃষক আন্দোলন যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্ত প্রদেশের জঙ্গি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যা প্রজাস্বত্ব আইন (Oudh Tenancy Act) প্রণীত হয়। উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যায় কংগ্রেস এক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে। হরদই, বরাবাঁকি, সীতাপুর ও লখনউতে র‍্যাডিকাল কৃষক নেতা মাদারি পাসীর নেতৃত্বে জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। গেইল ওমভেট-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাতারা অঞ্চলে অব্রাহ্মণ নেতাদের নেতৃত্বে ১৯১৯-২১ সালের মধ্যে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অন্ধ্রের ব-দ্বীপ অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব না দেওয়ার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মালাবার অঞ্চলে মোপলাদের অভ্যুত্থান ভূস্বামী বিরোধী জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। মালাবার অঞ্চলের মুসলমান কৃষকরা হিন্দু 'জেন্মি'দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কে. এন. পানিক্কর তাঁর "Peasant Revolts in Malabar in 19th and 20th centuries"

গ্রন্থে মোপলা বিদ্রোহের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের গ্রামীন পুনর্গঠন, কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, মাদক বর্জন ইত্যাদি কর্মসূচি কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, ''গান্ধিজি মহারাজের ডাকে সারা ভারতে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল তার পিছনে ছিল এক ন্যায়ের রাজ্য আর্বিভাবের আশা।''

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহিলারাও এই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকেননি। তারাও পিকেটিং, মিটিং, মিছিল ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। ছাত্রসমাজ অসহযোগ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল। ছাত্রেরা সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষায়তনে যোগদান করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় খিলাফৎ কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়। ব্রিটিশ সরকার 'রাজদ্রোহিতার'র অপরাধে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করে (সেপ্টেম্বর, ১৯২১ খ্রিঃ)। গান্ধিজি এই গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের সঙ্গো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির যোগদানে অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা সরকারকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ইংল্যান্ডের যুবরাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ভারতে আসেন (১৩ নভেম্বর ১৯২১ খ্রিঃ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য ইংল্যান্ডকে সাহায্য করার জন্য এক ধন্যবাদ জ্ঞাপক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তিনি বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। যুবরাজ ওই বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সরকার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করে। গান্ধিজি বাদে অধিকাংশ নেতাদেরই গ্রেফতার করা হয়। প্রায় ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী কারাবরণ করায় জেলখানাগুলি ভরে ওঠে। চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন, ''সারা ভারতই আজ বিশাল কারাগার।....সুতরাং কী এসে যায় যদি জেলের ভিতরে থাকি বা বাইরে থাকি''। সরকারি কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের মনোবল অটুট ছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। সত্যাগ্রহীদের উপর সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে গান্ধিজি বড়োলাট লর্ড রিডিংকে এক চরমপত্রে জানান যে, সাতদিনের মধ্যে রাজবন্দিদের মুক্তি না দিলে সারা ভারত জুড়ে খাজনা বন্ধ ও আইন আমান্য আন্দোলন করা হবে।

গান্ধিজি পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর বম্বেতে প্রথম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। মাদ্রাজেও একই ঘটনা ঘটে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জানুয়ারি। খেদার বরোইয়া সম্প্রদায়ের জঙ্গি নেতা বাবরদের ৭০টি সামাজিক ডাকাতি করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরার ঘটনা ছিল অনেক বেশি মর্মান্তিক। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামের সত্যাগ্রহীদের শান্ত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী থানা আক্রমণ করে আগুন লাগায়। ফলে ২২ জন পুলিশকর্মী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনায় মর্মাহত গান্ধিজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে পরিণত হতে পারে আশঙ্কা করে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তিনি ''ইয়ং ইন্ডিয়া'' পত্রিকায় লেখেন যে, অহিংস আন্দোলন পরিচালনার মতো পরিবেশ ও মানসিক প্রস্তুতি এখনও তৈরি হয়নি। এই অবস্থায় আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় দেশ ভরে উঠত। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধিজির ইচ্ছানুসারে আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তে প্রায় সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, ''আমরা শেষ হয়ে গেলাম'' (We are simply routed)। সুভাষচন্দ্র বাস তাঁর "The Indian Struggle" গ্রন্থে আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য গান্ধিজির সমালোচনা করেছিলেন। মহম্মদ আলি বারদৌলির সিদ্ধান্তকে ''আত্মসমর্পণের সমার্থক'' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ ও সময়োপযোগী ছিল কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। রজনীপাম দত্ত তাঁর "India Today" গ্রন্থে বলেছেন যে, 'হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন নয়, বিত্তশালী মানুষের শ্রেণি স্বার্থের প্রশ্নই ১৯২২-এর জাতীয় সংগ্রামকে শেষ করে দিয়েছিল (No the questions of 'violence' or 'non-violence', but the question of class interest in opposition to mass movement, was the breaking point of the national struggle of 1922)। "India and the Raj" গ্রন্থে সুনীতি কুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, বহুদিন ধরেই গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গো সমঝোতার রাস্তা খুঁজেছিলেন। চৌরিচৌরা তাঁর সামনে আন্দোলন প্রত্যাহারের সুযোগ এনে দেয়। অপরপক্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়, রজনীপাম দত্ত, সুনীতি কুমার ঘোষ প্রমুখ মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিকদের তীব্র সমালোচনা করেছেন ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপানচন্দ্র, আদিত্য মুখার্জি প্রমুখ ঐতিহাসিক গণ। বিপানচন্দ্র ও আদিত্য মুখার্জির মতে, ''আন্দোলন প্রত্যাহার কিংবা সংঘাতে না যাওয়ার পথ নেওয়াটা গণভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের রণনীতির একটা সহজাত অংশ। আন্দোলন প্রত্যাহারের অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা নয়; তা রণনীতিরই অপরিহার্য অংশ। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে,—গান্ধি যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন তা 'শ্রেণি সংগ্রাম নয়', 'জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম'। তিনি সচেতন ছিলেন, যে-

মুহূর্তে আন্দোলন শ্রেণি সংগ্রামের রূপ নেবে, সেই মুহূর্তে তাঁর জাতীয়তাবাদী ঐক্য ভেঙে পড়বে। তাই যখনই আন্দোলন অহিংসার পথ ছেড়ে সহিংস হয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, ''গান্ধিজি কর্তৃক আন্দোলনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে যাঁরা আজও সঠিক বলে মনে করেন, তাঁদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, কোনো প্রধান সেনাপতি যদি যুদ্ধের সময় হঠাৎ বুঝতে পারেন যে সেনাবাহিনী তাঁর নির্দেশ যথাযথ মেনে চলছে না, তাঁর পক্ষে সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। গান্ধিজি ছিলেন অসহযোগ সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি। চৌরিচৌরাতে আন্দোলন অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে দেখে তিনি মনে করলেন যে এই বিরাট আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ এখন আর তাঁর হাতে পুরোপুরি নেই। তাই তিনি আন্দোলনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।''

গান্ধিজির আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সারা ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধিজির সিদ্ধান্তকে ''একটি পর্বত প্রমাণ ভুল (Himalayan miscalculation) বলে চিহ্নিত করেছেন।'' মতিলাল নেহেরু যথার্থই বলেছেন, ''একটি স্থানের কিছু জনতার পাপে গান্ধিজি সমগ্র দেশবাসীকে শাস্তি দিলেন।'' পণ্ডিত রোমা রোঁল্যা বলেছেন, ''একজন ব্যক্তির হাতে দেশের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়ার মধ্যে বিপদ আছে এবং যে সময় আন্দোলন চরমসীমায় উপনীত তখন আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ বিপজ্জনক ছিল।'' ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ''যুদ্ধ শেষ। সমগ্র অভিযানও শেষ। পর্বত বাস্তবে মূষিক প্রসব করল।'' স্বরাজ লাভের প্রত্যাশায় সমগ্র ভারতবাসী যখন উদগ্রীব, তখন গান্ধিজির আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জনমতে তীব্র হতাশার সৃষ্টি করে। সারা দেশ গান্ধিজির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই সময় সরকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ গান্ধিজিকে গ্রেফতার করে।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল এবং এই ব্যর্থতার জন্য গান্ধিজি নিজেই অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তা এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষ বিশেষত কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির কাছে সত্যাগ্রহের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, মালিক শ্রেণি নয়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারই তাদের প্রধান শত্রু, একথা বোঝার মতো ক্ষমতা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির ছিল না। তাছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ছাত্রদের নিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালানো যায় না একথা গান্ধিজি উপলব্ধি করেন। খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে গান্ধিজি দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি। কারণ খিলাফৎ আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ ছিল না। খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত দৃঢ় নয়, একথা দূরদর্শী রাজনীতিবিদ বড়োলাট লর্ড রিডিং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বড়োলাট রিডিং এর সুযোগ নিয়ে গান্ধিজি এবং খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কৌশলে বিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল এবং জনমানসে গান্ধিজির ভাবমূর্ত নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাই সরকার গান্ধিজিকে এমন সময় গ্রেফতার করেন যাতে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জুডিথ ব্রাউন গান্ধিজির গ্রেফতার সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়া গান্ধিজির পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। এই গ্রেফতারের ফলে গান্ধিজির উপর জনসাধারণের সহানুভূতি জন্মে এবং তার বিশ্বাস অটুট থাকে।

কোনো আন্দোলনই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না। সুতরাং, অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা যায় না। প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। **প্রথমত,** অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো সফলতা হল এর সর্বভারতীয় চরিত্র। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেকথাই প্রমাণিত হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** এই আন্দোলনের ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। **তৃতীয়ত,** অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায় প্রথম জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। **চতুর্থত,** ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বড়োলাট ডাফরিন কংগ্রেসকে 'Microscopic minority'-র সংগঠন বলে অবজ্ঞা করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রমাণ করল এ ধরনের ধারণা ভিত্তিহীন। গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস প্রকৃতই লড়াকু চরিত্র লাভ করেছিল। **পঞ্চমত,** অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে কংগ্রেসে গান্ধিজির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনিই কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। কুপল্যান্ডের মতে, তিলক যা করতে পারেননি, গান্ধিজি তা করতে পেরেছেন, গান্ধিজি জাতীয় সংগ্রামকে বিপ্লবমুখী করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।'' **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে, এই আন্দোলনের ফলে রাতারাতি কংগ্রেস একটি আলোচনা সভা থেকে বিপ্লবী সংগঠন পরিণত হয় ("......the Indian National Congress was, almost overnight turned into a genuine revolutionary organisation. It was no longer a deliberative assembly but an organised fighiting force, pledged to revolution.")। অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা এখানেই যে, **গান্ধিজি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে একই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আনতে সমর্থ হয়েছিলেন,** যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আইন-অমান্য ও ভারত ছাড়ার মত গণ-আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলন :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশ ও বিদেশ থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেস্টা স্তিমিত হয়েছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় যুব সমাজকে পুনরায় বিপ্লববাদের প্রতি আকৃস্ট করে। ফলে বিপ্লবী কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

● **উত্তর ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপ :** সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীরা লখনউ শহরে মিলিত হয়ে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (Hindusthan Republican Association) গঠন করেন (১৯২৫ খ্রিঃ)। এই সমিতির সদস্য রামপ্রসাদ বিসমিল উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সমিতির বিপ্লবীরা উত্তর প্রদেশের কাকোরিতে একটি রেল ডাকাতি করে। অভিযুক্তদের ৪ জনের ফাঁসি ৪ জনের দ্বীপান্তর ও অন্যান্যদের কারাদণ্ড হয়। রামপ্রসাদ বিসমিলের ফাঁসি হয়। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। সাইমন কমিশন বিরোধী শান্তিপূর্ণ মিছিল পরিচালনা করার সময় লাহোরে লালা লাজপত রায় পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হবার কয়েকদিন পর মারা যান। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিপ্লবী ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ ও বটুকেশ্বর দত্ত, লালা লাজপত রায়ের হত্যাকারী পুলিশ কমিশনার স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন। ভগৎ সিং-এর গুলিতে স্যান্ডার্স মারা যান। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে পুলিশ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালালে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সরকারকে সতর্ক করার জন্য ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৮মে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ এবং ইস্তাহার বিলি করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা এই ডাকাতির জন্য ২৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে। (Revolutionary Nationalism in the Post World War I) স্যান্ডার্সকে হত্যার জন্য বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করা হয়। শুরু দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার অন্যতম আসামি বিপ্লবী যতীনদাস বিচারাধীন বন্দিদের রাজনৈতিক মর্যাদা দাবি করে অনশন শুরু করেন। দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাসের মৃত্যু হয় (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খ্রিঃ)। যতীনদাসের মৃত্যুতে সারা দেশে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই মামলায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে অভিযুক্ত করা হয়। প্রমাণাভাবে বটুকেশ্বর দত্ত অব্যাহতি পেলেও ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হয়। বলা বাহুল্য, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি মকুব করার জন্য বহু আবেদন করা হলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য চন্দ্রশেখর আজাদ তাঁর সহকর্মীদের মৃত্যুর জন্য বড়োলাটের রেল উড়িয়ে দিতে চেস্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে লাহোর ও নয়াদিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা করা হলেও তাঁকে ধরা যায়নি। সরকার তাঁকে ধরার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। শেষে জনৈক বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকতায় এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেলে। এই সময় পুলিশের গুলিতে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু হয়।

● **বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন :** প্রাক্তন বিপ্লবীদের প্রচেস্টায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে থেকে বাংলায় 'সারথি', 'আত্মশক্তি', 'বিজলি' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করতে থাকে। এই সময় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে ডাক্তার চরিত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক বিপ্লবী সংগঠনের কথা বলেন। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত মিসেস কেনেডি নামে জনৈক ইংরেজকে হত্যা করে। তবে এই সময় অনুশীলনী সমিতির সঙ্গে যুগান্তর দলের বিরোধ দেখা দেওয়ায় বিপ্লবী কার্যকলাপ বিশেষ কিছু হয়নি। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী ঘটনা ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, লেম্যান নিধন এবং বিনয়-বাদল দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই সময় বাংলার বিপ্লবীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেক বিপ্লবীরা সাম্যবাদ বা কমিউনিজম আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা শ্রেণি সংগ্রামের পথ গ্রহণ না করে সন্ত্রাসের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার এই সব বিপ্লবীদের "সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট" আখ্যা দিয়েছেন। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সূর্যসেন বা মাস্টারদা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সূর্যসেন তাঁর সহকর্মী গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদেদার প্রমুখেরা একসাথে বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা করলে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামেই তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল। সূর্যসেনের নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। মাস্টারদা নামে পরিচিত সূর্যসেন ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তাঁর নেতৃত্বে

চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য কয়েকটি ডাকাতিও করেছিল। বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য সরকার সূর্যসেনকে গ্রেফতার করে এবং বিচারে দু বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তিনি আবার বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী সেনা' বা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (Indian Republican Army) গঠন করে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠী মনে করেছিলেন যে, যদি সুপরিকল্পিতভাবে কোনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা এবং স্বল্পকালের জন্যও চট্টগ্রাম জেলাকে যদি ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করা যায় তাহলে সমগ্র দেশব্যাপী এক তীব্র উত্তেজনা ও অদম্য অনুপ্রেরণায় সঞ্চারিত হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ এপ্রিল রাত্রি দশটার সময় সশস্ত্র বিপ্লবীরা ইংরেজ সৈন্যের পোশাক পরে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হয়। চারিটি দলের প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একটি দল টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বিকল করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করবে; একটি দল ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করবে; গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের নেতৃত্ব প্রধান দল পুলিশের অস্ত্রাগার লুঠ করবে এবং চতুর্থ দলটি অন্য একটি অস্ত্রাগার লুঠ করে। এই সময় তাঁদের হাতে একজন ইংরেজ মেজর ও কয়েকজন পুলিশ সান্ত্রী নিহত হয়। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার থেকে প্রচুর বন্দুক রাইফেল লুঠ করলেও গোলা বারুদ নিতে তারা ভুলে যায়। অস্ত্রাগার লুঠ করার পর বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত পুলিশ বাহিনী প্রথমে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া বিপ্লবীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার ফলে তারা সাহায্যের জন্য কোনো খবরও পাঠাতে পারেনি। দু-দিন পরে সরকার বিপ্লবীদের দমনের জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠালে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেললে বিপ্লবীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে বিপ্লবীদের অনেকেই নিহত হন। সূর্যসেন সহ কয়েকজন বিপ্লবী জালালাবাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে অবশ্য বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই ধরা পড়েন। চট্টগ্রামের গয়রালা গ্রামে জনৈক গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্যসেন ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় (১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রিঃ)। অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল সহ অনেক বিপ্লবীকে দীপান্তর অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ধরা পড়ার আগেই প্রীতিলতা ওয়াদেদার আত্মহত্যা করেন। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সূর্যসেনের অবদান প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন—''সূর্যসেন সশস্ত্র সংগ্রামের যে পথ দেখিয়েছিলেন তারই সর্বোচ্চ পরিণতি দেখা যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐতিহাসিক সংগ্রামে।''

চট্টগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গভর্নর জ্যাকসন ও গভর্নর অ্যান্ডারসনকে দুজন নারী বিপ্লবী হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসু ঢাকার পুলিশ ইনস্পেকটর জেনারেল লেম্যানকে গুলি করে হত্যা করেন (আগস্ট, ১৯৩০ খ্রিঃ)। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত নামে তিন বীর বিপ্লবী প্রকাশ্য দিবালোকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দিয়ে পুলিশের আই. জি. সিম্পসন ও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ক্রেগকে হত্যা করে। শেষে পুলিশের হাতে ধরা না দেবার জন্য তারা তিনজনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে বাদল গুপ্তের মৃত্যু হয়। অসুস্থ অবস্থায় বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত বিনয় বসু হাসপাতালে মারা যান। দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হবার পর তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে 'অলিন্দযুদ্ধ' নামে খ্যাত। স্বাধীনতা লাভের পরে এই তিনজন দুঃসাহসিক বিপ্লবীর নামানুসারে ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম রাখা হয় 'বি-বা-দি-বাগ' বা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

প্রায় একই সময়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত সেখানকার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে গুলি করে হত্যা করেন (৭ এপ্রিল, ১৯৩১ খ্রিঃ)। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রদ্যোত ভট্টাচার্য ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনাথবন্ধু ও মৃগেন ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে গুলি করে হত্যা করেন। এছাড়া ২৪ পরগণার সেশন জর্জ গার্লিক ও কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট এলিসন ও পুলিশ সুপার খানবাহাদুর আসানুল্লাহ বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে কয়েকবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের পিছনে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এখানে বলা দরকার যে, শিক্ষিত মহিলারাও বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী সূর্যসেনের সহকারিণী ছিলেন প্রীতিলতা ওয়েদেদার, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলি প্রমুখ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় প্রীতিলতা ওয়েদেদার-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করা হয়। প্রীতিলতা পুলিশের হাতে ধরা দেবার পরিবর্তে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বীণা দাস সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনই এই সময় জাতীয় সংগ্রামের একমাত্র ধারা ছিল না। বিপ্লবী কার্যকলাপের ফলে সারা দেশে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের পিছনে বিপুল গণ সমর্থনের তা অন্যতম কারণ। বিপ্লবীদের আত্মহত্যা, স্বদেশপ্রেম সমগ্র ভারতবাসীর মনে যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল।

ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকেই ভারতের নিম্নবর্গের মানুষ, বিশেষত কৃষক সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তবে একথা ঠিক যে, এই নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে শাসন ক্ষমতা দখলের কোনো পরিকল্পনা করেনি, তারা শুধু চেয়েছিল তাদের সমস্যার প্রতি ইংরেজ সরকার দৃষ্টি দিক। কিন্তু সরকার নিম্নবর্গের মানুষের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল।

জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চুড্ডাপা ও নেলোরের চেঞ্চু জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য রক্ষার দাবিতে আন্দোলন করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ওড়িশার দশপাল্লা সামন্ত রাজ্যে খোন্ড জনগোষ্ঠী বিদ্রোহ করে। ছোটোনাগপুরের ওরাঁও নেতা যাত্রা ভগত এখানে একটি আন্দোলন করেন। যাত্রা ভগত একেশ্বরবাদ, মদ, মাংস, আদিবাসী নৃত্য বর্জন ও ঝুম চাষে প্রত্যাবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন। সরকার কঠোর হাতে এইসব বিদ্রোহ দমন করে। ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদের এবং মণিপুরে থাডো ও কুকীদের প্রতিবাদ, রাজস্থানের দুঙ্গারপুর, সান্থ ও বানস্বারার ভিলজন গোষ্ঠী বিদ্রোহ করেছিল। বলা বাহুল্য, সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে।

জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে গান্ধিজি বিহারের চম্পারণ গুজরাটের খেদাতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। চম্পারণে নীল চাষিরা 'তিনকাঠিয়া' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং খেদার কৃষকরা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। গান্ধিজির মধ্যস্থতায় সরকার ও কৃষকদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়ায় আন্দোলন বন্ধ হয়। জাতীয় নেতা হিসাবে গান্ধিজির প্রতিষ্ঠার পিছনে চম্পারণ ও খেদার কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন-এর সমসাময়িককালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে কেরল অঞ্চলের মালাবার জেলার মুসলমান মোপলা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে মোপলা কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে মোপলা কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল হিন্দু 'জেন্মি'দের বিরুদ্ধে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মানজেরিতে মালাবার জেলা কংগ্রেসের অধিবেশনে মোপলা কৃষকদের দাবিকে সমর্থন জানানো হয়। খিলাফত আন্দোলন মোপলা আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। মালাবারের মোপলা চাষিদের স্বাধীনতা লাভের আশায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোপলাদের জনপ্রিয় নেতা আলি মুজলিয়র। মোপলা বিদ্রোহীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে, জমিদার মহাজনদের হত্যা করে তাদের বাসভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা আলি মুজলিয়রকে মোপলা রাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করে। মোপলা বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২৩৩৭ জন মোপলা বিদ্রোহী রাষ্ট্রীয় দমননীতির ফলে নিহত হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অন্ধ্রের গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ও গুন্টুর জেলায় ভূমিরাজস্ব দানের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূলে ছিল স্থানীয় ভূমি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা, যাদের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আদায় করত। এরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত এবং খাজনার হিসাব রাখত। কৃষক এবং সরকারের মধ্যবর্তী হিসাবে এদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বেশি। সরকার এদের অবৈধ আয় বন্ধ করার জন্য নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সরকারি কর্মচারীদের একই সঙ্গে পদত্যাগ করার ঘটনা সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হলেও এই আন্দোলনের প্রভাব কৃষক সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল।

দক্ষিণ ভারতের গুন্টুর জেলায় কৃষকরা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সরকারকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে। গুন্টুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষক নেতারা এবং টি. প্রকাশক ও কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের অবসান ঘটে। অন্ধ্রপ্রদেশের 'রাম্পা' অঞ্চলের জঙ্গি কৃষক আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

জনপ্রিয় আল্লুরি সীতারাম রাজু। স্থানীয় মহাজনদের শোষণ এবং বিভিন্ন অরণ্য আইন এই জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল। আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় 'রাম্পা' বিদ্রোহ নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। আল্লুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে 'রাম্পা' অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল (আগস্ট, ১৯২২ খ্রিঃ: মে, ১৯২৪ খ্রিঃ)। সীতারাম রাজুর দুর্ধর্ষ গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। মাদ্রাজ সরকার বিশেষ পুলিশ বাহিনী ও আসাম রাইফেলস্-এর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পালানোর সময় আল্লুরি সীতারাম রাজু সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। সীতারাম রাজুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'রাম্পা' বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলী তালুকে তুলোর মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার ২২ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি করলে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের ব্যাপকতায় সরকার বাধ্য হয়ে খাজনার পরিমাণ হ্রাস করলেও কৃষকদের ক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে কুনওয়ারজি মেহেতা ও কল্যাণজি মেহেতা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য বল্লভভাই প্যাটেলকে অনুরোধ করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বারদৌলী তালুকের পাতিদার বা অবস্থাপন্ন কৃষকদের সম্মেলনে গান্ধিজি ও বল্লভভাই প্যাটেলের উপস্থিতিতে সরকারকে খাজনা না দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডি. এন. ধনাগার বলেছেন যে, বারদৌলী আন্দোলন অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল। আন্দোলনের বিষয় ছিল রাজস্ব ধার্য করা ও রাজস্বের হারের পুনর্বিন্যাস। জমির নিয়ন্ত্রণে পারস্পরিক সম্পর্ক, জমির প্রকৃত ব্যবহার, জমির পুনর্বণ্টন ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নগুলিকে গান্ধিবাদীরা তাদের সত্যাগ্রহে স্পর্শ করেননি। (More fundamental questions about the relations between land control and actual use of land, land redistrileution and so no, were not touched upon by Gandhians in the Satyagraha.)। গান্ধিজি ও তাঁর অনুগামীরা কখনোই তাঁদের পাতিদার সমর্থকদের দ্বারা খাজনা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি, তাছাড়া পাতিদাররা যে অনগ্রসর দুবলা জনগোষ্ঠীর মানুষ (ঋণদাস)-দের 'হালিপ্রথা'র মাধ্যমে শোষণ করতেন—এই বিষয়টিও গান্ধিবাদীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। যাই হোক, বারদৌলী আন্দোলন সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অধ্যাপক সমরকুমার মল্লিক বারদৌলী আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত,** ধর্মীয় আবেদনের উপর নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এই আন্দোলনকে জোরদার করেছিল। হিন্দু কৃষকদের প্রভুর নামে এবং মুসলমান কৃষকদের খোদার নামে শপথ করে কর বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত। **দ্বিতীয়ত,** এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বল্লভভাই প্যাটেলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সব মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিঠুবেন পেটিক (পারসি), সারদাবেন শাহ, সারদা, মনিবেন প্যাটেল (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বোন) প্রমুখ। ছাত্ররাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। আমেদাবাদের শ্রমিকরা বারদৌলী কৃষক আন্দোলনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের ব্যাপকতায় সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বারদৌলী কৃষক আন্দোলন সফল হলেও একথা ঠিক যে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সম্পন্ন কৃষক বা পতিদারদের স্বার্থে। ডি. এন. ধনাগারে যথার্থই বলেছেন যে, এই আন্দোলন জমির মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়নি এবং আন্দোলনে তাঁরাই নেতৃত্ব দেন যাঁরা কখনোই নিম্নবর্গীয় কৃষক স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। জনগোষ্ঠীয় 'কলিপরাজ' কৃষকদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে উচ্চবর্ণের পাতিদারদের স্বার্থে রাজস্বের হার কমাতে সফল হয়েছিল বারদৌলী সত্যাগ্রহ। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ভাষায়—"Gandhian national certainly brought some concrete benefits for the peasant proprietors of Gujarat."

১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে বামপন্থী শক্তি কৃষক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের দ্বারা গঠিত শ্রমিক এবং কৃষক পার্টি (ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি) বাংলা, পাঞ্জাব, বম্বে এবং উত্তরপ্রদেশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৩০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে কৃষকরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে। এই সময় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষকদের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। করের বোঝা ও মহাজনের ঋণশোধ করতে না পারার ফলে বহু কৃষকই তাদের জমি হারায়। ফলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। বারদৌলী কৃষক আন্দোলনের সাফল্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক সংকট, আইন অমান্য আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের তৎপরতার ফলে বাংলায় কৃষক আন্দোলনে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছিল। বাংলাদেশে এই সময় যে সব কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ আন্দোলন ছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। ক্রমে এই আন্দোলন পাকুন্দিয়া, এগারসিন্ধু, জাঙ্গালিয়া, মির্জাপুর, জামালপুর প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা, নোয়াখালি, রংপুর, ত্রিপুরাতেও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিষাণ সভার নেতৃত্বে বর্গাদারেরাও সংগঠিত হয়। দিনাজপুরে বর্গাদারদের নেতৃত্বে আন্দোলন সফল হয় এবং জোতদাররা বর্গাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য হয় (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে)।

গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে ব্রিটিশ সরকার যখন প্রায় দিশেহারা, ঠিক সেই সময় আসামের নাগা উপজাতিদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। নাগা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাদুনাভ ও গাইডিলিউ। মিশনারি স্কুলে শিক্ষালাভ করে গাইডিলিউ স্বজাতির মুক্তির কথা চিন্তা করেন। যাদুনাভ এর

সংস্পর্শে গাইডিলিউ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠেন। যাদুনাভ ও গাইডিলিউ-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার নাগা আন্দোলনে যোগদান করে। বিদ্রোহী নাগারা বেগার খাটা, গৃহ কর দেওয়া বন্ধ করে। সরকার সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে। শেষ পর্যন্ত যাদুনাভ ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় (নভেম্বর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে)। যাদুনাভের ফাঁসি হওয়া সত্ত্বেও নাগা বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর হয়নি। যাদুনাভের পর গাইডিলিউ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। সরকার বহু চেস্টা করে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে গাইডিলিউকে বন্দি করে এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এর ফলে নাগা বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যায়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে দিনাজপুর ও মালদহ জেলার সাঁওতাল বর্গা চাষিরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিনাজপুরের বাঁশারি গ্রামের সামু ও জিতু বোটকা। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মালদহ ও দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সচেস্ট হন। বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জোতদারদের ধানের গোলা ও বাড়ি। জিতু ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতি। গান্ধিজির আদর্শে প্রভাবিত জিতু নিজেকে 'সেনাপতি গান্ধি' বলে প্রচার করেন। সুপ্রকাশ রায়ের লেখনী থেকে এই বিদ্রোহের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, ''দলে দলে সশস্ত্র পুলিশ ছুটে এল বিদ্রোহ কম্পিত গ্রামাঞ্চলের দিকে। এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে রক্ত বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য তারা পাগল হয়ে উঠল। পুলিশের হাতে রাইফেল আর মেশিনগান, অন্যদিকে সাঁওতালদের অস্ত্র তিরধনুক, বল্লম আর তলোয়ার, বিদ্রোহী আর পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলল, উভয়পক্ষের বহু হতাহত হল।'' বলা বাহুল্য, অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তিরধনুক নিয়ে সাঁওতালদের পক্ষে বেশি দিন লড়াই করা সম্ভব ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা জিতু ও সামু ব্রিটিশের হাতে বন্দি হওয়ায় সাঁওতাল বিদ্রোহের যবনিকা নেমে আসে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে)।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির ডাকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদানকারী জাপান ব্রহ্মদেশ জয় করে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে একদিকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম এবং অন্যদিকে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনায় ব্রিটিশ সরকারের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। সরকারের এই দুর্দিনে ত্রিপুরার মহারাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত নির্দেশানুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সেনা চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে জাপানকে প্রতিরোধের চেস্টা করবে বলা হয়। জামাতিয়া ও রিয়াং সম্প্রদায় ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের সকলেই সরকারের নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। রিয়াং সম্প্রদায়ের সর্দারের মধ্যে প্রধান 'রায়' পদ পাবার জন্য উদগ্রীব খগেন্দ্র চৌধুরী (রাজার দালাল) কৌশলে রিয়াংদের রাজার সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি করান। রিয়াংদের জোর করে সৈন্যবাহিনীকে ভর্তি করানোর বিরুদ্ধে রতনমনি ঠাকুর প্রতিবাদ জানান। তিনি রিয়াংদের স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর ডাকে হাজার হাজার রিয়াং স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রত গ্রহণ করে। রিয়াংরা ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন অগ্রাহ্য করে রতনমনি ঠাকুরকে তাঁদের 'রাজা' বলে ঘোষণা করে। সরকার, অত্যন্ত জঘন্যভাবে রিয়াং বিদ্রোহ দমন করে। শেষ পর্যন্ত রতনমনি ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয় এবং অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। রতনমনি ঠাকুরের মৃত্যুর ফলে রিয়াং বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিহীন বর্গা হাজং কৃষকরা প্রচলিত টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বেগার শ্রম, ভেটপ্রথা ও সেলামি প্রথা প্রভৃতি শোষণের প্রথাকে হাজং অঞ্চলে টঙ্ক প্রথা বলা হত। এই টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং উপজাতির কৃষকরা রাসমনির নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহীদের দাবি ছিল 'টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ', 'টঙ্ক জমিতে কৃষকের সত্ত্ব', ''পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের মতো খাজনার পরিমাণ ধার্য করা।'' ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাজং বিদ্রোহ দমনে সচেস্ট হন। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২৫ হাজার সৈন্যের সঙ্গে রাসমণি ও সুরেন্দ্র হাজং-এর নেতৃত্বে তিরধনুক, বর্শা নিয়ে হাজং বিদ্রোহীদের যে সংঘর্ষ হয়েছিল ইতিহাসে তার সাক্ষ্য মেলা ভার। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে রাসমণি ও সুরেন্দ্র হাজং-এর মৃত্যু হলে হাজং বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করে এবং যার ফলে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে টঙ্ক প্রথার অবসান ঘটে।

• দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলন : তেভাগা আন্দোলন

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে 'তেভাগা' আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত বাংলার কৃষক সম্প্রদায় উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু-ভাগ নিজেদের অধিকারে রাখার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ গ্রামীণ জনগণের এই উত্থান ভারতের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত সর্বপ্রথম কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন শুরু হয় প্রথম উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুরের 'আতওয়ারি' নামক একটি গ্রামে। ক্রমে এই আন্দোলন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের ব্যাপকতায় শঙ্কিত বাংলার সরকার 'বর্গাদার বিল' গেজেট ভুক্ত করার ফলে প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের পরের থেকে তেভাগা আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়ে।

• পুন্নাপ্রা-ভায়লারের গণ সংগ্রাম (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে (কেরল) সামন্ত প্রভুদের শোষণ, খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী

মানুষদের ভয়ানক দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন নারকেল ছোবড়ার কারখানার শ্রমিক, জেলে, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির মধ্যে কমিউনিস্টদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টরা এদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম লগ্নে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান সি. পি. রামস্বামী আয়ার মার্কিন ধাঁচের সংবিধান চালু করে নিজের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। একদিকে খাদ্যাভাব অন্যদিকে মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য গঠনের প্রয়াস জনসাধারণের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। কে. সি. জর্জ এবং টি. ভি. টমাসের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। ২২ অক্টোবর থেকে আলেপ্পে-শেরতলৈ অঞ্চলে একটি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এর দুদিন পর ২৫ অক্টোবর পুন্নাপ্রা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও জনতার মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এই অসম লড়াইতে বহু সাধারণ মানুষ এবং পুলিশ কর্মী নিহত হয়। ধর্মঘট ডাকার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত হয়।

পুন্নাপ্রার লড়াইকে কেন্দ্র করে ২৫ অক্টোবর সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সামরিক আইন জারি করা হয়। পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারে নির্যাতিত সাধারণ মানুষ জলে ঘেরা দ্বীপ ভায়লারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৭ অক্টোবর সেনাবাহিনী ভায়লার গ্রাম আক্রমণ করে। আধুনিক সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে কাঠের বর্শা, রামদা এবং পাথরের টুকরো নিয়ে প্রতিবাদী মানুষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই অসম যুদ্ধে আটশরও বেশি সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের মৃত্যু হয়।

পুন্নাপ্রা-ভায়লারের কৃষক সংগ্রাম ও হত্যাকাণ্ড সমগ্র দেশে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কঠোর দমননীতির সাহায্যে পুন্নাপ্রা-ভায়লারের গণ অভ্যুত্থান দমন করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত রামস্বামীর স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বাধীনতার পরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ভারতের অঙ্গীভূত হয়।

● তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫১ খ্রিস্টাব্দ)

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় সংঘটিত হয় গেরিলা কৃষক যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে তিন হাজার গ্রামের ৩০ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র কৃষক অংশগ্রহণ করেছিল। ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই বিদ্রোহ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। আধুনিক ভারতের তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ হল সবচেয়ে বড়ো গেরিলা কৃষক যুদ্ধ।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে হায়দ্রাবাদ ছিল নিজাম শাসিত একটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্য। হায়দ্রাবাদের শাসক মুসলমান হলেও এখানকার অধিকাংশ প্রজাই ছিল হিন্দু। উর্দুভাষী মুসলিম শাসক গোষ্ঠী স্থানীয় তেলেগু, কানাড়ি ও মারাঠাভাষী হিন্দু প্রজাদের উপর আধিপত্য করত। হায়দ্রাবাদের পূর্বদিকে ওয়ারাঙ্গাল, নালগোণ্ডা, নিজামাবাদ, করিমনগর, আদিলাবাদ, মহবুবনগর এবং মেদাক নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানার জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি, যার অধিকাংশই ছিল গরিব কৃষক। তেলেঙ্গানার অধিকাংশ কৃষকেরই নিজস্ব কোনো জমি ছিল না। নিজাম শাসিত তেলেঙ্গানা ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমান এবং উচ্চবংশ জাত হিন্দু দেশমুখ ও জায়গিরদাররা গরিব কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। এই সমস্ত দেশমুখ ও জায়গিরদাররা কৃষকদের কাছে নানা ধরনের কর আদায় করত এবং অনেক সময় জোর করে তাদের বেগার খাটতে বাধ্য করত। জমিদার এবং হিন্দু দেশমুখদের অত্যাচারের ফলে অসহায়, নিঃস্ব, গরিব কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলির উপর নিজামের পুলিশ-মিলিটারি এবং 'রাজাকার' নামে গুন্ডাবাহিনী অকথ্য অত্যাচার করত। ১৯৩০-এর দশকে এখানে আন্দোলন শুরু হয়। তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অন্ধ্র মহাসভার মাধ্যমে তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

নালগোন্ডা জেলার জলগাঁও তালুকে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। কমিউনিস্ট ও অন্ধ্রমহাসভার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনগণকে নিজামশাহি বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে এবং বেআইনি খাজনা, বেগার শ্রম, জমি থেকে উচ্ছেদ এবং শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানায়। কৃষকরা দলে দলে অন্ধ্রমহাসভায় যোগ দিতে শুরু করে। ক্রমে তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে অন্ধ্রমহাসভার শাখা, পঞ্চকমিটি বা পঞ্চায়েত কমিটি এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে ওঠে। নালগোন্ডা জেলার জলগাঁও তালুকে রামচন্দ্র রেড্ডি নামে জনৈক অত্যাচারী দেশমুখ পানাকুর্তি গ্রামের একজন ধোপানির জমি দখল করতে উদ্যোগী হলে তরুণ কমিউনিস্ট ডোড্ডি কোমারাইয়া তাঁকে বাধা দিতে এসে নিহত হন। এই ঘটনা কৃষকদের বিদ্রোহী করে তোলে এবং আন্দোলন জলগাঁও তালুক ছাড়িয়ে সূর্যপেট এবং হুজুরনগর তালুকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বরাঙ্গাল এবং খাম্মাম জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙা ইট, কাঁচাবেল, পাথরের টুকরো, লঙ্কার গুঁড়ো, বাদিশাল নামে বড়ো ধরনের গুলতি, তিরধনুক, লাঠি ছিল বিদ্রোহীদের হাতিয়ার। বিদ্রোহীরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করত। বলা বাহুল্য, পুলিশও নিষ্ক্রিয় ছিল না। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীরা গেরিলা

লড়াইয়ে যুদ্ধ করে যে সমস্ত গ্রাম মুক্ত করতে পেরেছিল সেখানে বেগার প্রথা তুলে দেওয়া হয়, কৃষি মজুরদের মজুরির হার বৃদ্ধি হয়, এবং যারা জমি হারিয়েছিল তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, এ সময়ে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে ২৬ হাজার সৈন্য হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করে এবং হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ দমন করা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল।

তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। **প্রথমত,** তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ফলে বেগার প্রথার অবসান ঘটে। **দ্বিতীয়ত,** তেলেঙ্গানা থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটে। **তৃতীয়ত,** জায়গিরদারি প্রথার উচ্ছেদ করা হয়। **চতুর্থত,** ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। অধ্যাপক সুনীল সেন লিখেছেন যে ''তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিজয় ত্রিকার্য। নিজামের শাসনের অবসান হল। শতাব্দীর পুরোনো স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হল। হায়দ্রাবাদ ভারত ইউনিয়নে যোগ দিল। কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা এখানে ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক শক্তি নিস্তব্ধ হল। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের এটি একটি দৃষ্টান্ত। অন্ধ্রজাতির ঐক্য হল সাধিত।'' সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, ''তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল হায়দ্রাবাদের শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রমিক শ্রেণিই ছিল এই সংগ্রামের চালিকা শক্তি। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে ভূমি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামই ভারতের জনগণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম প্রয়াস। তেলেঙ্গানা ভারতের কৃষি বিপ্লব আর তার সংগ্রামের অগ্রদূত।''